ইলিশ মাছ উৎপাদনে অর্থনীতিতে নতুন প্রত্যাশা

সেলিনা আক্তার

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। বাঙালির অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু এ মাছ যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও আমিষ জাতীয় খাদ্য সরবরাহে এ মাছ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ইলিশ দেশের জাতীয় সম্পদ। এ সম্পদ রক্ষায় দেশের প্রত্যেক নাগরিকদের এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। ইলিশের সহনশীল উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ডিমওয়ালা মা ইলিশ রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা ইলিশ রক্ষা পেলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদনে উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের অবদান প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ ।দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনে ইলিশের অবদান প্রায় ১২ দশমিক ২২ শতাংশ, যার বাজারমূল্য ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি। জিডিপিতে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। বাংলাদেশের ইলিশ পেয়েছে জিআই পণ্যের মর্যাদা। দেশে-বিদেশে ইলিশ মাছের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। একক মৎস্য প্রজাতি হিসেবে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনে ইলিশ সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে। ৬.৭১ লক্ষ মেট্রিকটন ইলিশ মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে।

ইলিশ পছন্দ করে না, এমন বাঙালি দেশে ও বিদেশে খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। ইলিশ স্বাদে ও গুণে সত্যিই অতুলনীয়। সাগর ও নদী দুই জায়গাই ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র। বিগত বছরগুলোয় ইলিশ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল এবং এমন প্রেক্ষাপটে মা ইলিশ শিকারের ওপর অবরোধসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেড়েছে।

পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশের বিচরণক্ষেত্রে পানির গুণগত মান ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। সেই সঙ্গে কমছে ইলিশের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণ। ইলিশ গবেষকরা বলছেন, এর ফলে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদনের ওপর একসময় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ইতোমধ্যেই নদীতে ইলিশের উৎপাদন কমে গেছে। এর অন্যতম কারণ নদীর পানি দূষণ। ইলিশের যেসব বিচরণক্ষেত্র আছে, সরকারের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র চাঁদপুর সেসব স্থানে দীর্ঘ সময় ধরে পানির মান পরীক্ষা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা প্রতিবছর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (ডিও-ডিসলভ অক্সিজেন), পিএইচ, পানি ও বায়ুর তাপ, হার্ডনেস (ক্ষারত্ব), অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। জলজ প্রতিবেশে দূষণ যেকোনো মাছের জন্যই ক্ষতিকর। তবে ইলিশ অনেক বেশি সংবেদনশীল মাছ এবং দূষণের ফলে প্রতিবেশের সামান্য পরিবর্তন ইলিশ নিতে পারে না। ইলিশ তার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। পানিতে অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি ইলিশের খাবারের চাহিদায় পরিবর্তন করতে পারে।

ইলিশের বিচরণক্ষেত্রে পানির মান বিচারে অন্যতম নিয়ামক হলো পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা ডিও। যদি ডিওর পরিমাণ প্রতি লিটারে পাঁচ মিলিগ্রামের কম হয়, তবে তা জলজ পরিবেশের জন্য কম উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পদ্মায় গত পাঁচ বছরে ডিওর মান কমেছে। ২০১৮ সালে পদ্মার পানিতে ডিওর গড় মান ছিল ৮ দশমিক ৭০ এবং এরপর থেকে প্রায় প্রতিবছর কমছে। ২০২২ সালে ডিওর মান ছিল ৫ দশমিক ৪১। মেঘনায় ২০১৮ সালে ডিওর গড় মান ছিল ৮ দশমিক ৪০ এবং এটি ২০২২ সালে কমে ৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ হয়েছে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাসায়নিক যৌগ হলো অ্যামোনিয়া। যে পানির মান ভালো, সেখানে এর উপস্থিতি শূন্য থাকতে হয়। পদ্মায় ২০১৮ সালে পানিতে অ্যামোনিয়ার গড় উপস্থিতি ছিল শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। গত বছরও তা-ই ছিল। কিন্তু মেঘনায় পানিতে অ্যামোনিয়ার গড় উপস্থিতি শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ এবং এটি গত বছর শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, অ্যাসিড ও ক্ষারের পরিমাপক হলো পিএইচ। জলজ প্রাণীর সহনীয় পরিবেশের ক্ষেত্রে পিএইচ সাড়ে ৭ থেকে সাড়ে ৮-এর মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু ৭-এর নিচে নয়। পদ্মা নদীতে পিএইচের গড় উপস্থিতি ছিল ৮ এবং গত বছর এর পরিমাণ কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৪৭। মেঘনায় ২০১৮ সালে পিএইচের উপস্থিতি ছিল ৮ দশমিক ১৩ এবং ২০১৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে পদ্মায় পানির তাপমাত্রা প্রায় ২৫ থেকে বেড়ে ৩০ ডিগ্রি হয়েছে। এ সময় অবশ্য মেঘনায় পানির তাপ ২৭ দশমিক ৪০ থেকে কমে প্রায় ২৭ হয়েছে।

মা ইলিশ মূলত বছরে সাধারণত দু'বার ডিম দেয়, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ভাদ্র মাস থেকে মধ্য কার্তিক) ও জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি (মধ্য পৌষ থেকে মধ্য ফালগুন)। তবে দ্বিতীয় মৌসুমের তুলনায় প্রথম মৌসুমে প্রজনন হার বেশি। একটি মা ইলিশ প্রতি মৌসুমে একবারে সর্বোচ্চ ১ থেকে ২.৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ থেকে ২৩ লাখ ডিম পাড়ে।

আমাদের দেশে প্রধানত তিন প্রকারের ইলিশ পাওয়া যায়। ইলিশ, চন্দনা ইলিশ ও গুর্তা বা কানগুর্তা ইলিশ। টর্পেডো আকৃতির রূপালি রংয়ের মাছ পৃষ্টদেশ কিছুটা কালচে আভা। আরও চার প্রজাতির ইলিশ বাংলাদেশ উপকূলে পাওয়া যায়। রামগাছা/রামচৌককা, পেতি চৌককা, চৌককা/চৌককা ফাইসা ও করোমেনডেল ইলিশ। দেশের সব নদ-নদী, মোহনা, উপকূলীয় এলাকায় ডিম ছাড়ে ইলিশ। মেঘনা নদীর ঢলচর, মনপুরা দ্বীপ, মৌলভীর চর ও কালির চর এলাকাকে ইলিশের প্রধান প্রজনন ক্ষেত্র ধরা হয়, যার আয়তন প্রায় ৭ হাজার বর্গকিলোমিটার।

ইলিশ পোনা ৬-১০ সপ্তাহে ১২ সেমি থেকে ২০ সেমি পর্যন্ত বড় হয়। তখন তাদের জাটকা বলে। একটি জাটকা মাছ পূর্ণাঙ্গ ইলিশে পরিণত হতে সময় নেয় ১ থেকে ২ বছর। তখন আয়তনে ৩২ সেমি থেকে ৬০ সেমি এবং ওজনে ১ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। জাটকা মা ইলিশের সাথে সমুদ্রে চলে যায়। সেখানে পূর্ণাঙ্গ ইলিশে পরিণত হয়ে আবার প্রজনন কালে নদীতে ফিরে আসে।

স্বাদে, ঘ্রাণে, রূপে অন্যান্য মাছকে পেছনে ফেলে ইলিশ বাঙালি সমাজে ‘মাছের রাজা’ হিসেবে সমাদৃত। শুধু যে রূপে গুণে বিষয়টা এমনও না, অন্যান্য মাছের পুষ্টিগুণের দিক থেকেও এগিয়ে আছে এই সমুদ্র থেকে আসা নদীর রাজা। ইলিশ মাছ রোগ প্রতিরোধেও সহায়ক। পুষ্টিবিদরা বলছেন, প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশ মাছে প্রোটিন থাকে ২১.৮ গ্রাম, ভিটামিন সি থাকে ২৪ মিলিগ্রাম, শর্করা আছে ৩.৩৯ গ্রাম, খনিজ রয়েছে ২.২ গ্রাম ও চর্বি ১৯.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ও বিভিন্ন খনিজ রয়েছে ১৮০ মিলিগ্রাম, তাছাড়াও রয়েছে খনিজ লবণ, আয়োডিন এবং লিপড। যা অন্যান্য মাছ ও মাংসের তুলনায় অনেক বেশি। ওয়ার্ল্ড ফিশের হিসাবে ওমেগা-৩ পুষ্টিগুণের দিক থেকে স্যামন মাছের পরের স্থান এই ইলিশের। জনপ্রিয়তায় শীর্ষে স্যামন ও টুনা মাছের পরই এই আমাদের ইলিশের অবস্থান।

চিকিৎসকদের মতে, ইলিশ মাছ হার্ট সুস্থ রাখে, রক্ত সঞ্চালন ও বাত নিয়ন্ত্রণের সহায়ক, রাতকানা রোধে, ক্যান্সার মোকাবেলায়, হাঁপানি রোধে, অবসাদ দূর করতে, ত্বকের যত্নে, শিশুদের মস্তিষ্কের গঠন করতে সহায়ক। গবেষণায় দেখা গেছে, ইলিশে আছে উচ্চমাত্রার প্রোটিন। তাছাড়াও আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যা রক্তের কোলেস্টেরল ও ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দেয়, ফলে হার্ট সুস্থ থাকে। তাই হৃদরোগীদের জন্য ইলিশের তেল উপকারী। ইলিশ মাছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ একেবারেই কম।

বর্তমানে দেশের প্রায় নদ-নদীতে পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ। এর প্রধান আহরণ এলাকা হচ্ছে- মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল, তেঁতুলিয়া, কালাবদর বা আড়িয়াল খাঁ, ধর্মগঞ্জ, নয়াভাঙগানি, বিষখালি, পায়রা, রূপসা, শিবসা, পশুর, কচা, লতা, লোহাদিয়া, আন্ধারমানিকসহ অনেক মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চল। ইলিশের বিচরণ ও উৎপাদন এলাকা ইলিশের বিচরণ ও উৎপাদন এলাকা সারা বছর ইলিশ ধরা পড়ে। নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ বিপযয়, জাটকা নিধন ও ডিমওয়ালা ইলিশ বেশি মাত্রায় আহরণে গত কয়েক দশকে ইলিশের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। ইলিশ সংরক্ষণে নিম্ন পদ্মায় ইলিশের অভয়াশ্রম করায় আগের চেয়ে পরিমাণ বেড়েছে। ইলিশ মাছ সারা বছরই প্রজনন করলেও বেশি করে অক্টোবর মাসের বড় পূর্ণিমায়। এসময় ৬০-৭০ শতাংশ ইলিশ পরিপক্ক ও ডিম ছাড়ার উপযোগী হয়। সাধারণ এক বছরের বয়সে মাছ পরিপক্ক হয়। আবহাওয়ার তারতম্যে অনেক সময় ৮-১০ মাস বয়সেও পরিপক্ক হতে পারে।

সরকারের নানামুখী উদ্যোগে ইলিশের উৎপাদন আশাতীতভাবে বেড়েছে। সরকারি তথ্যে দেখা যায়, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইলিশের আহরণ ছিল ২ দশমিক ৯৮ লাখ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৭১ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে ১৫ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৯২ শতাংশ।উল্লেখ্য, ইলিশের বর্তমান উৎপাদন ৫ লাখ ৭১ হাজার টন।

ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকার বিভিন্ন উদ্যেগ গ্রহণ করেছেন,জেলে পরিবারকে স্বল্প সুদে ঋণ, সেলাই মেশিন ও আয়বর্ধক নানা কাজে উৎসাহী করা হয়েছে। বিশেষ করে ইলিশ ধরেন, এমন জেলেদের নানা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এসব উদ্যোগের কারণে ইলিশ উৎপাদনে সফল হয়েছে সরকার। জানা যায়, দেশের সকল মানুষের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে। ইলিশ মাছ সংরক্ষণেও নানা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ইলিশ মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের জীবিকা নির্বাহে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলে পরিবারকে চাল দেয়া হচ্ছে। সেলাই মেশিন, গরু, ছাগল ও ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে জেলে পরিবারের মাঝে।

জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান তৈরিতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে গুরুত্বপূর্ণ এই খাত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলছে এক কোটি ৯৫ লাখ মানুষ মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। এছাড়া দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ৩ দশমিক ৫৭ শতাংশ। মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৪১ সালে দেশে মাছের উৎপাদন দাঁড়াবে ৯০ লাখ মেট্রিক টন। ইলিশের উৎপাদন অতীতের সকল রেকর্ড অতিক্রম করেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এটা আরো ব্যাপক আকার

ধারণ করবে। ইলিশ উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম স্থানে রয়েছি। জাটকা রক্ষায় ও মা ইলিশ আহরণ বন্ধে জলে, স্থলে ও আকাশপথে বিভিন্নভাবে মনিটর করা হচ্ছে। ইলিশের অভয়াশ্রমে জাটকা নিধনকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। যারা কারেন্ট জাল, বেহুন্দী জালসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জাল তৈরি করে জাটকা নিধন করে তাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সাজা প্রদান ও জরিমানা করা হচ্ছে।

শঙ্কার কথা, নদীদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও স্বাভাবিক পানি প্রবাহ সঙ্কটে বড়ো ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে যাচ্ছে বিশ্বজয়ী বাংলাদেশের রূপালি ইলিশ। বাংলাদেশি ইলিশের স্বাদ, রং ও আকার যে আগের মতো নেই তা যেন ঝুঁকির পূর্বাভাসকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে ইলিশ গবেষকরা সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় এরই মধ্যে শুরু করেছেন নানা কার্যক্রম। কেবল জাটকা নিধন প্রতিহত করলেই চলবে না। ইলিশ সম্পদ বাড়লেও যদি এর মৌলিকত্ব ধরে রাখা না যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশে-বিদেশে ইলিশের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কমে যাবে। তাই ইলিশ নিয়ে কাজ করা জনবলই নয়, ইলিশ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে হবে সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সব মহলকে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প-কারখানার বর্জ্য নদী ও সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ায় তা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিশেষ করে ইলিশ মাছ অন্য মাছের চেয়ে বেশি স্পর্শকাতর হওয়ায় এর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বেশি পড়ে।জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে সাগরে জেগে উঠছে অসংখ্য ডুবোচর। অথচ ইলিশ গভীর পানির মাছ। ডুরোচরের কারণে ইলিশের গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে।

সরকারের তদারকি আর জেলেদের সাবধানতা আর অসাধুতা কেঁটে গেলে ধীরে ধীরে ইলিশ ফিরে পাবে তার পুরনো ঐতিহ্য। মাছে ভাতে আমরা বাঙ্গালি হলেও ইলিশে বাঙ্গালি এটা আমরা বলতেই পারি।আগামীতে সঠিকভাবে ইলিশ ব্যবস্থাপনা করা গেলে এবং পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ইলিশের উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সহনশীল উৎপাদন বজায় থাকবে।

#

পিআইডি ফিচার